মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ খুনীর সন্ধানে খুনি

জহর সেনমজুমদার

কোনো কোনো উপন্যাসের পত্রিকা - নির্ভর অপরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি কখনো - কখনো হাতে চলে এলে দেখা যায় তার অনেক কিছুই ঝাপসা হয়ে এসেছে, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, এমনকি কীটদষ্ট হওয়ার কারণে কোথাও কোথাও বোঝাও যায় না লেখক ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় শব্দ ভান্ডার। অনুমানকেই তখন সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহার করে প্রবেশ করতে হয় উপন্যাসের গভীর তলে-অবতলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'খুনী' উপন্যাসটি ঠিক এ রকমই এক দুস্পাঠ্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ কারুবাসিত জীবনভাবনার সার্থক উদারহণ। বলা যায় ঃ 'নতুন জীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত এই উপন্যাসটি কীটদষ্ট হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু তা সত্ত্বেও অবুঝ কীটদের যাবতীয় ধ্বংসাত্মক সংক্রমণ অতিক্রম করবার মতো নিভৃত ও শক্তিশালী জীবনীশক্তি আছে বলেই খুনী' উপন্যাসটি লেখক মানিকের এক আশ্চর্য সৃজনী চৈতন্যের দীপ্ত প্রদীপ। সাধারণ তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস সম্পর্কে যে ধরনের আগ্রহ, ঔৎসুক্য এবং প্রজ্ঞাদীপ্ত গবেষণা লক্ষ করা যায়, শেষ পর্যায়ের উপন্যাস সম্বন্ধে সেই একই রকম আগ্রহী উন্মোচন কিন্তু বড়ো একটা দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, এমন ধারণাও অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত যে লেখক হিসেবে শেষ পর্যায়ের তিনি শারীরিক ও মানসিক কারণে স্তিমিত, নতুন বাঁক বদলের মৌল সৃষ্টিক্ষমতা এ সময় থেকেই অন্তর্হিত হতে শুরু করেছে এবং নিজের সৃজনী প্রতিভাকেও তিনি আর ঠিকঠাক চালনা করতে পারছিলেন না। প্রথম পর্যায়ের রত্নপ্রসবের পরবর্তী রক্তাল্পতা যেন ফুটে উঠেছিল তাঁর লেখায়, চেতনায়, সৃষ্টিকার্যের ক্লান্ত আত্মযন্ত্রণায়। 'খুনী' পড়লেই বোঝা যায় ঃ এ সব কথা আংশিক সত্য, পক্ষপাতদুষ্ট এবং সর্বোপরি অ-পঠিত বাক্যচর্চামাত্র। মানিক রচনাবলির একাদশ খণ্ড (বাংলা আকাদেমি) অনুসরণ করে সংকলিত উপন্যাসটি সম্পর্কে প্রাথমিক যে তথ্যগুলি প্রদান করা আবশ্যক, তা হল ঃ

প্রথমতই উপন্যাসটি সুনীলকুমার ধর সম্পাদিত 'নতুন জীবন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পৌষ ১৩৫০ থেকে (প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা) শুরু করে দু-একটি সংখ্যা বাদ দিয়ে বৈশাখ ১৩৫২ পর্যন্ত (দ্বিতীয় বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা) মোট ১২টি কিস্তিতে 'খুনী পরিবেশিত হয়।

দ্বিতীয়ত উপন্যাসটির প্রথম ৪টি কিস্তি মুখ্যত চলিত ভাষায় লিখিত হলেও ৫ম থেকে শেষ কিস্তি পর্যন্ত লেখক সাধুভাষার অনুসারী হয়েছেন। এক্ষেত্রে, ৫ম কিস্তির শেষে, লেখক স্বীকারোক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন— 'কাহিনিটি মনের মধ্যে স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করায় এখন মনে হইতেছে শুদ্ধ ভাষাই কাহিনিটির পক্ষে বেশি উপযোগী হইবে'। লেখকের এই স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায় 'খুনী' উপন্যাসের গৃহীত বিষয় ও ভাবনার সমাহিত আন্তর বিশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সম্ভবত তিনি ভাষা বদলের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গ্রন্থজন্ম পায়নি। সাধারণত লেখক মানিক তাঁর পত্রিকায় লেখার গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পরিমার্জন তথা প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন করতেন। 'খুনী'-র ক্ষেত্রে সে সুযোগ পাননি তিনি। ফলে পত্রিকার সংখ্যাভিত্তিক ক্রমচলমানতার কারণে এবং সেই সঙ্গে সংশোধনকার্যের অভাব হেতু উপন্যাসটির কাহিনিতে যেমন অসংলগ্নতা লক্ষ করা যায়, তেমনই বাক্যগঠনশৈলীও কোথাও কোথাও অসংগতি আক্রান্ত। অনেক স্থান মূলত পাঠযোগ্য স্পষ্টতা পায়নি বলে রচনাবলির সম্পাদকমণ্ডলী অনুমানভিত্তিক কোনোরকম শব্দ সংযোগ না -করে কেবল চিহ্নই (ডট এবং থার্ড ব্রাকেট) ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও উপন্যাসটির সামগ্রিক আবেদন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং ব্যবহৃত এই ডট এবং ব্রাকেট মূল কাহিনিশৈলীকে এক নতুনতর বি-নির্মাণ সম্ভাবনায় জারিত এবং সমৃদ্ধ করেছে।

চতুর্থ উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশের সমমুহূর্তে লেখক মানিক যে সব রচনাদি নিষ্পন্ন করেছেন, সেগুলি হল দর্পণ, প্রতিবিম্ব, চিন্তামণি, শহরবাসের ইতিকথা, আদায়ের ইতিহাস প্রভৃতি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় — লেখক মানিক এই পর্যায়কালে যথেষ্ট সৃজনমগ্ন ছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায় ঃ লেখক মানিক এই পর্যায়কালেও অতৃপ্ত এবং অন্বেষণকারী, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্বে নিজেকে ভেঙেই জীবনের পথ গড়েছেন, সর্বোপরি সৃজনী চৈতন্যের বাঁক বদলে আবার এসে দাঁড়াতে চাইছেন নবধারাজলে— আত্মযন্ত্রণা এবং আত্মপরিক্রমার মধ্যে দিয়ে এ যেন নতুনতর আরম্ভ — এ যেন বৈজ্ঞানিক প্রশ্নমুখী বাস্তবতার সঙ্গে অন্তর্দীপ্ত বিকাশমুখী বাস্তবতার সমন্বয়-সাধন। বাস্তবতার বোধ থেকে বাস্তবতার অন্তর্ভেদী বোধিতে এইভাবে পৌঁছেছেন তিনি। আর পৌঁছনোটা সার্থক হয়েছে বলেই সচেতন সংলগ্নতার অন্তর্দীপ্তি তাঁর উপন্যাসকে আস্তিক্যধর্মী বহুরৈখিক প্রজ্ঞার স্বাদ এনে দিয়েছে। ফলত প্রশ্নমুখী বাস্তবতার ভেতর এসে আশ্রয় নিলেন। 'খুনী' তার চূড়ান্ত উদাহরণ। বলা যায় কথাসূত্রের বিকাশ, উপলব্ধি এবং চলমান পরিণতি হল এই উপন্যাস।

এর ফলেই 'খুনী' উপন্যাস সহজেই কীটসংক্রমণজাত ধ্বংসচক্রের বাইরে চলে আসতে পেরেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভূমিতে দাঁড়ানো দীর্ণ মুকুন্দ, আসলে আমাদের সকলেরই দাম্পত্য সংকটের ভাঙা প্রতিরূপ। অর্থনৈতিক সংকটে পীড়িত মধ্যবিত্ত স্বামীর বিষণ্ণ ও উদ্‌ভ্রান্ত নৈতিক অস্থিরতা নিয়ে সে যেন আমাদের প্রত্যেকেরই বুকের পাঁজর ভেঙে সময়সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ধনতান্ত্রিক ঘূর্ণাবর্তের নাস্তিক্যে আমাদের প্রত্যেকেরই

জীবন হয়ে উঠেছে এক অভিশপ্ত অমানুষিকতার জৈব কারখানামাত্র। মুকুন্দের মতোই আমরা যে দাম্পত্যের মধ্যে আছি— সে কোনো অনুরাগী দাম্পত্য নয়, অনুগামী দাম্পত্যও নয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চলমান জীনের যাবতীয় স্থিতিশীলতা ভেঙে যাবার পর, প্রত্যয়ী জীবনবোধ বিপর্যস্ত হয়ে যাবার পর মধ্যবিত্তের প্রতিটি দাম্পত্যই তখন এক একটা সুপ্ত জতুগৃহ, এক একটি অবর্ণনীয় নষ্টনীড়। মুকুন্দ শুধু সেই অবরুদ্ধ বহ্নিজ্বালার জতুগৃহটি দেখিয়ে দিয়েছে, মুকুন্দ সেই নষ্টনীড়ের নেতিবাদী দুঃখবরণ ক্রমাগত সহ্য করতে স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিয়েছে— ধর্ম, স্বাস্থ্য, প্রাণ, সমাজ, আনন্দ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ বা স্বাভাবিকতা বলে কোথাও আর কিছু নেই। নিশ্চিন্ত প্রত্যাশায় মানুষ যেদিকেই হাত বাড়াবে, সব দিকেই দেখতে পাবে মনুষ্যজীবনের সামগ্রিক বিনষ্টি। প্রত্যাশা থেকেই জন্ম নেয় তীব্র পিপাসা। আর সেই অপরিপূর্ণ ও অচরিতার্থ পিপাসার অনিশ্চিত গহ্বরে আবদ্ধ মানুষ ক্রমশ অপ্রাপ্তির ক্ষোভে ভেঙে বিক্ষুব্ধ হবে, সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্নতায় হয়ে উঠবে যাপিত জীবনের আয়না। লেখক মানিক 'খুনী' উপন্যাসের মুকুন্দকে অবলম্বন করে, তার জীবন - আবর্তের মধ্য থেকেই তুলে আনলেন Basic insecurity -র আলো আঁধারি। তুলে আনলেন আত্মপ্রক্ষেপ ও আত্মপ্রলাপের alterego। মুকুন্দর ভেতরকার অসহায় দ্বিতীয় সত্তার অন্তর্গত বিবেককে কাজে লাগিয়েই লেখক মানিক মধ্যবিত্ত চেতনা সম্পর্কিত নির্মম শনাক্তকরণ যেন বা সমাপ্ত করলেন। বলতে দ্বিধা নেই ঃ মুকুন্দ সমগ্র উপন্যাসেই যেন বা অসহায় অন্তর্লোক চালিত একজন মানুষের উত্তপ্ত অন্তর্দাহের বাইরের রূপ। হতাশা ও সংশয়, অনুশোচনা ও অসামঞ্জস্যের ভেতর সে সব অর্থেই প্রবলভাবে জীবনের উত্তাপ পুঁজেছে জীবনেরই মধ্যে। কঠিন যান্ত্রিক সময়ের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে এই মুকুন্দ মুখ্যত বারবার নিজেকে আক্রমণ করে কিংবা নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেই ক্রমশ আত্মিক অবনমনের মধ্যে দিয়ে সময় সমাজ ও বাস্তবকে বুঝে নিয়েছে। একজন সূক্ষ্ম সংবেদনশীল শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটের যোগ যেমন এক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়েছে, তেমনই সমাজজীবনের বিপন্ন প্রচ্ছদটাও একটু একটু করে উন্মোচিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার ঃ 'খুনী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুকুন্দ কিন্তু খুব বড়ো রকমের বিপ্লবী বা দার্শনিক নয়। আসলে সে অন্যদের মতোই একজন অ্যাভারেজ মানুষ তার চিত্তবৃত্তি নিঙড়োলে একদিকে যেমন বেরিয়ে আসবে সাপ্রেশড লিবিডো, অন্যদিকে তেমনই পাওয়া যাবে পূতিগন্ধময় সমাজে ছোটো ছোটো ভাবে আত্মসংরক্ষণের নোংরা স্বার্থপরতাও। আসলে লেখক মানিক তাকে সম্পূর্ণভাবে অবক্ষয়ের রাহুগ্রাসে রেখেই অর্থ-রাজনৈতিক বহির্বাস্তব এবং অন্তর্বাস্তবের প্রতিচ্ছবি তুলে এনেছেন। মুকুন্দ কীভাবে এই অবক্ষয়ের রাহুগ্রাসে আছে? কীভীবে এই বিশ্বাস খুঁজেছে— 'খুনী'-র কেন্দ্রীভূত কাহিনি তারই অমোঘ বর্ণনা। আসলে মুকুন্দ বা মুকুন্দর মতো মধ্যবিত্ত আমরা তো নানাভাবেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইচ্ছাপুরণের যন্ত্র মাত্র। তবু লেখক হিসেবে মানিক মুকুন্দকে ভেতরের বিশ্লেষণ ও বিপন্ন আত্মসমীক্ষায় স্বতন্ত্র জীবনবীক্ষণের মানুষে পরিণত করেছেন। সত্যি বলতে অন্যদের মতো অ্যাভারেজ মানুষ হয়েও এই উপন্যাসে সে অ্যাভারেজ হয়ে রইল না মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, তার ভেতরকার বিষাদ ও ছাইচাপা আগুন এবং দ্বিতীয়ত, তার ভেতরকার সমালোচনা ও সচলতার ক্রমিক দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েন। এইভাবে দ্বিধা উদ্‌বেগ বেদনা ও সংশয়ের মধ্যে দিয়ে আত্মসমীক্ষা বাংলা উপন্যাসে খুব কম চরিত্রকেই আমরা করতে দেখেছি। এর জন্য লেখক মানিক তাকে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের ভেতর স্থাপন করেননি। বরং রাজনৈতিক সচেতনতার সংহিতা ছাড়াই মুকুন্ত মুখ্যত নিজেই নিজের শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নিজের সঙ্গে নিজেই খেলেছে এক দ্বিপাক্ষিক খেলা। একমাত্র আত্মিক সংকট তৈরি হলেই কিন্তু এই খেলাটা খেলা যায়। মুকুন্দর ক্ষেত্রে এই আত্মিক সংকটটা উদ্ভূত হয়েছিল মুখ্যত ধনদাস (নামটা লক্ষণীয়) দত্তের আপিস থেকে চাকরি চলে যাবার পর, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাজনিত অভ্যন্তরীণ সুপ্ত ভীতি থেকে। এই ভীতির কাছেই তো মানুষকে বারবার চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হয়। মুকুন্দর জীবন সেই পরীক্ষা, অবক্ষয়ের ক্রান্তিলগ্নে শতচ্ছিন্ন জীবন দেখবার সমকালীন পরীক্ষা। মুকুন্দকে এই পরীক্ষায় রেখে লেখক মানিক একই সঙ্গে দুটি বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করলেন ঃ

> প্রথমত, তিনি স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিলেন যে চাকরি থাকা-না-থাকাটা স্পন্দিত প্রাত্যহিকতায় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চাকরি থাকা অবস্থায় মানুষ ঠিকভাবে বুঝতে পারে না সমাজ ও বাস্তবের অগ্নিতে তার প্রকৃত অবস্থান। মুকুন্দের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ধনদাসের ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সময়কালে সে বোঝেনি সময়ের বয়ন। কিন্তু চাকরি থেকেই সে বুঝল ঃ এতদিন সে ছিল শ্রেণিবাস্তবের মধ্যবিত্ত, এখন সে আক্রান্ত মধ্যবিত্ত প্রলেতারিয়েত হয়ে গেছে। মুকুন্দর মাধ্যমে মানিক শ্রেণিবাস্তবের স্থানবদল করে দেখালেন মানুষকে যে কোনো মুহূর্তে তার বৃন্ত থেকে (এক্ষেত্রে চাকরি থেকে) খসিয়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত প্রলেতারিয়েতে পরিণত করে দেওয়া যায়। ধনতন্ত্র যা যখন তখন ইচ্ছেমতো করতে পারে। আর তখনই কিন্তু শাপে বর হয়। কেন-না ধনতন্ত্রের কাছে সব মানুষের পরিচয়ই যে 'প্রলেতারিয়েত' —তখনই তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়ে ওঠে। মুকুন্দর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। চাকরি যাবার পর প্রলেতারিয়েত হয়েই সে বুঝতে পেরেছে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের মূল অদৃশ্য খুনী আর অন্য কেই নয়— ধনতন্ত্র।
>
> দ্বিতীয়ত, তিনি স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিলেন যে মানুষ নিজে তার ব্যক্তিবিশেষহ আক্রান্ত না-হলে যেমন সমাজ ও জীবনের শ্রেণিভেদী বশীকরণ প্রক্রিয়া বুঝতে পারে না, তেমনই তার মধ্যে কোনোরকম ন্যাচারাল গিলটি কানশানেসও আসে না। আক্রান্ত হলেই এবং জীনযাপনে নাভিশ্বাস উঠলেই মানুষ বুঝতে পারে ঃ 'সাবজেক্ট পরিশান'। আর তখনই খুলে ফেলা যায় গতানুগতিক জীবনদর্শনের মিথ্যে খোলস। মুকুন্দর ক্ষেত্রেও এইভাবে আক্রান্ত চেতনাস্রোত তৈরি হয়ে গেছে। অন্তর্বর্তী রিক্ততা আর মানুষ্যত্বের তিক্ত সংবেদনায় তাই তার কাছে জীবনও বাস্তবের প্রতিটি বার্থ কোষ সম্পূর্ণ খুলে গেছে। এই চোখ খোলা আক্ষেপস্পন্দ মানুষটাকে মুকুন্দর মধ্যে থেকে বার করে আনাটাই এই

উপন্যাসে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি যেন বা এক রূপক অভিঘাত। এখান থেকেই শুরু হল কথাবৃত্তের আত্মসমীক্ষা। মনে রাখা দরকার : নির্বিবাদী জীবনের আত্মসমীক্ষা আর আক্রান্ত জীবনের আত্মসমীক্ষার ভেতর তফাত অনেক, অনেকখানি। মুকুন্দর কথাবৃত্ত আক্রান্ত হবার পরই তাই এই উপন্যাস দাম্পত্যের ছোটো পরিসর ভেঙে মধ্যবিত্ত বর্ণমালার নতুন প্রিতিবেদন তৈরি করে দিল।

প্রতিবেদনের রৈখিকতা পুরোপুরি না-ভাবলেও 'খুনী' উপন্যাসে মানিক কিন্তু পূর্ববর্তী উপন্যাসের পৃথিবীলোক থেকে অনেকখানিই সরে এসেছেন। ক্লিষ্ট ও বিবিক্ত অস্তিত্বের যন্ত্রণা নিয়ে 'খুনী'-র মুকুন্দ যেভাবে মূল্যজ্ঞানের চেতনায় নিজেকে বারবার প্রোথিত করেছে। ফালাফালা করেছে, দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা নিয়ে জীবনের জটিল যন্ত্রণায় নেমেছে— তা থেকেই বোঝা যায় ঃ মুকুন্দর আত্ম - সঞ্চালন অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যবোধের বিরুদ্ধে এক ধরনের আত্মসহায়ক Transvaluation, খণ্ডিত মানবাত্মার অন্তর্গূঢ় স্বরূপ সহ যন্ত্রজীবনের বিরুদ্ধে পালটা জীবনধর্মী মানুষে সমগ্র অবগাহন। লেখক সম্ভবত এই ব্যক্তিহীন জীবনধর্মী অবগাহনই মনে প্রাণে চেয়েছিলেন। আর তাই উপন্যাসের শুরু মুকুন্দ এক, আর শেষের মুকুন্দ অন্য আর এক। বলা যায় ঃ প্রথম সত্তার মৃত্যুর পর মুকুন্দর ভেতর এক দ্বিতীয় সত্তার জন্ম হয়েছে। দুই সত্তা বিশিষ্ট মুকুন্দর প্রথম সত্তা বিবৃত ও আলোচিত হয়েছে উপন্যাসে। আর দ্বিতীয় সত্তা? বিবৃত ও আলোচিত না-হয়েও মধ্যবিত্ত জীবনচর্যার আত্মকেন্দ্রিক ভরাডুবির ভেতর একটি দীর্ঘ ও অমোঘ প্রশ্নচিহ্ন হয়ে অন্য এক বিমিশ্রিত স্পন্দন ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে।

।। দুই।।

প্রত্যেক মধ্যবিত্তের দাম্পত্যজীবনের একটা অন্তরঙ্গ আশ্লেষের ভূগোলবই আছে। মুকুন্দর চলাচল সেই ভুগোলবইয়ের ভেতর দিয়েই শুরু হয়েছে। এই ভূগোলবইটা খুললেই বেশ কিছু তথ্য যেন একসঙ্গে দ্রুত বার হয়ে আসে। যেমন মুকুন্দ দশটা - পাঁচটার ঘাড়গোঁজা মধ্যবিত্ত শ্রেণিপ্রতিভূ। গদ্য লেখার ঝোঁক আছে, কিন্তু লিখে উঠতে পারে না। স্ত্রী কামিনী কলকাতায় বাসন মাজা থেকে শুরু করে আপিসের রান্না —চার বছর ধরে অক্লান্তভাবেই করে আসছে। কামিনীর দাদা মনোহর পাটনায় চাকরি করে। কামিনীর মা ও অন্য ভাইবোনেরা সেখানেই থাকে। কামিনীর পূর্ববতী পারিবারিক ছবিটা হল এইরকম—

মা

পুত্রসন্তান কন্যাসন্তান

মনোহর ঃ তমোহর কামিনী ঃ যামিনী

স্ত্রী (রাধারাণী)

সন্তানসংখ্যা ঃ নিদেনপক্ষে পাঁচ

(বয়স ঃ দুই তিন থেকে চোদ্দ)

ভূগোলবই থেকে প্রাপ্ত এই তথ্যাদি 'খুনী' উপন্যাসের ক্ষেত্রে এসেছে শুধুমাত্র একটা প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনে, এসব তথ্যাদি মূলত গৌণ। কিন্তু যে তথ্য কাহিনির মূল ধৃ-কেন্দ্র বা বীজসূত্র, যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে কাহিনি এবং যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে প্রবল জীবন সংকট, সেটি হল —মুকুন্দর চাকরি চলে গেছে ছ-মাস আগে এবং এই ভয়াবহ সংবাদটি কামিনী একেবারেই জানে না। মুকুন্দ কামিনীর কাছে চাকরি যাবার সংবাদটি চাপা দিয়ে গোপন করে ছ-মাস ধরে সংসার চালিয়েছে কিঞ্চিৎ জমানো টাকায় আর কামিনীর বড়ো ট্র্যাংকে গচ্ছিত কিছু গয়নাগাটি আর সোনার হার আত্মসাৎ করে। এভাবেই চলছিল। ধরা পড়তে পড়তেও শেষ পর্যন্ত পড়েনি মুকুন্দ। বারবার, বুদ্ধি করে, পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে সে। কিন্তু একদিন এল, যেদিন আর কোনো কিছুকেই সামলানো গেল না। মুকুন্দ যেই বলল— 'আজ আপিস যাব না ভাবছি', যেই বলল — 'তিনদিন ছুটি নিয়েছি', কামিনী তৎক্ষণাৎ আবদার ধরে বসল:

> আপিস যখন যাবে না ...মনুদের বাড়ি নিয়ে চলো না আজকে আমায়? খুব সেজেগুজে যাব। নতুন হারটা মানুকে দেখানোই হয়নি। সেবার এসে ঘটা করে চুড়ি দেখিয়ে গেল আমায়— আমি যেন জানিনে শাশুড়ির অনন্ত ভেঙে চুড়ি গড়িয়েছে, সোয়ামি দেয়নি। আমার সোয়ামি হার দিয়েছে, না -দেখিয়ে ছাড়ব কেন? যাবে নিয়ে?

প্রত্যেক দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী-দের এমন হঠাৎ হঠাৎ আবদারের মুখোমুখি প্রায় প্রত্যেক স্বামীকেই পড়তে হয়, যা একান্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তবসম্মত। কিন্তু মুকুন্দর কাছে এই স্বাভাবিক বাস্তবসম্মত আবদারটাই হয়ে দাঁড়াল এক আতঙ্কিত বা উৎকণ্ঠিত জীবনসত্যের সামনে দাঁড়াবার কঠিন পরীক্ষা। কারণ কামিনী জানে, না, কিন্তু সে হারটা আর যথাস্থানে নেই। চাকরিরত সক্ষম স্বামী চাকরি হারানোর অক্ষম স্বামীতে পরিণত হওয়া মাত্র দৈনন্দিনের সংসার তীব্র ক্ষুধায় তাকে সম্পূর্ণ গিলে নিয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক আকস্মিক জড়তায় মুকুন্দ মনুদের বাড়ি যাবার প্রস্তাবে বাইরে থেকে 'বেশ তো' বলে রাজি হল বটে, কিন্তু ট্র্যাংক খুললেই লুকিয়ে রাখা ফাঁকিটা যে হুড়মুড় করে একেবারে নগ্নভাবে সামনে এসে দাঁড়াবে— এই ভাবনায় মুকুন্দ কিন্তু ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট শঙ্কিত হল, বিচলিত হল। এই শঙ্কা বা মানসিক বিচল থেকেই বিব্রত

বা অস্থির মুকুন্দ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে —সত্যটাকে স্পষ্ট উন্মোচিত হতে দেবে, নাকি প্রকৃত সত্যের মুখ বন্ধ করবার জন্য সত্যেরই গলা টিপে ধরবে? মুকুন্দর তখন বাইরেও সমস্যা, ভেতরেও সমস্যা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সঙ্গে মানসিক স্থিতাবস্থার যোগ গভীর। আর তাই অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় টান পড়তেই মুকুন্দর মানসিক স্থিতাবস্থাও দ্রুত নড়ে গেল। নড়বড়ে হয়ে গেল। 'খুনী' উপন্যাসের কাহিনি এখানে থেকেই সামাজিক বক্রতা এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় সমর্পিত হয়েছে। চাকরি থাকাকালীন মুকুন্দের এই সমস্যা ছিল না, সংকটও ছিল না। মধ্যবিত্তর আত্মকেন্দ্রিক নিরাপদ ভূমি ও নীড় অর্জিত থাকায়, করতলে থাকায়, মুকুন্দ এই পর্যায়ে জীবনের জৈব উচ্ছ্বাসের বাইরে আসেনি এবং আসতেও চায়নি। দাম্পত্যজীবনের যৌন আমোদে বশীভূত সে এই সময় বরং বেশ তারিয়ে তারিয়ে কামিনীকে বাস্তবে ও স্মৃতিদৃশ্যে রক্তমাংসসহ উপভোগ করেছে। দেখেছেঃ

> খাটের ওপর রাখা শুকনো কাপড়গুলির সামনে খাট ঘেঁষিয়া দাঁড়ানো কামিনী, আঙুলে কাপড় কুচানোর ছন্দের তালে - তালেই যে বাঁ পায়ের হাঁটু দিয়া মাঝে মাঝে খাটে ঠোকা দিতেছে। তার পালিশ - করা জুতোর একটি ভিতরে কামিনীর বাঁ করতল ঢুকানো, উবু হইয়া বসিয়া একটু সামনে ঝুঁকিয়া ডান হাতে বুরুশ ধরিয়া সে জুতোয় ঘষিতেছে, টান পড়ায় পিছনে ব্লাউজের তলাটা উপরে উঠিয়া শুভ্র পিঠের একটু অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দুই হাঁটুর চাপে স্তন দুটি ব্লাউজ ঠেলিয়া বাহির হইয়ে চাহিতেছে দু-পাশে।
>
> ...মুকুন্দের জুতো বুরুশ করিতে বসায় সর্বাঙ্গে অপরূপ
>
> দোলনের ছন্দ নামিয়াছে কামিনীর...

দাম্পত্যের সহযোগী এই জৈবস্নান, এই জৈব দংশন, এই 'তির্যকে সমতলে ঢেউ তোলা অবিরাম দোলনের ছন্দ', এই 'চোখ ঝলসানোর' শরীরী স্থূলতা—মধ্যবিত্ত মুকুন্দও এর বাইরে যায়নি, আর যাবেই বা কেন? এ তো প্রাত্যহিক প্রাপ্তি, এ তো মোহকারী নেশা— এর মধ্যেই তো মজে থাকে মন। মধ্যবিত্ত মন এই স্থিতিশীল স্থূলতাকে অগ্রাহ্য করবে কেন? মুকুন্দও এইভাবে স্থিতিশীল স্থূলতায় চাকরির নিরাপত্তা সহ মুগ্ধ ও বশীভূত ছিল। ধনদাসের ধনতন্ত্র থেকে যেই সে উৎখাত হল, ধনদাসের ধনতন্ত্রে যেই সে অপ্রয়োজনীয় হল— তখনই সে মুখ্যত কঠিন বাস্তবের কর্কশ অভিক্ষেপে নিক্ষিপ্ত হল। বুঝল ঃ তার এই সজ্জিত দাম্পত্য, তার এই বিচিত্র মুগ্ধকার ঝিমঝিমি দাম্পত্য, তার এই ঢেউ তোলা আবিরাম দোলনের দাম্পত্য— যার ভেতর রক্ত ও মাংস ছড়িয়ে এতদিন নির্ভাবনায় ডুবে ছিল সে— আসলে অর্থনৈতিক এবং সাজিক স্থিতাবস্থা ছাড়া এ-সব একেবারেই মূল্যহীন। স্থূলতা এক কৃত্রিম জীবনের সংক্রমণে এইভাবে যুগ যুগ ধরেই মানুষকে বেঁধে রাখে বলে মানুষ বোঝে না তার নিহিত চৈতন্যের ভাষা ও সম্ভাবনাকে। মুকুন্দও চাকরি থাকাকালীন এ-সব সত্য থেকে বহুদূরে এককভাবে, আলাদাভাবে থেকেছে। চাকরি চলে যাবার পরবর্তী ক্ষোভ এব অস্থিরতা, ভীতি এবং বিপন্নতা, তাকে এমনভাবে গ্রাস করে নিল যে সে প্রকৃত জীবনসত্যের সামনে সাহস করে দাঁড়াবার পরিবর্তে বরং সত্যটাকেই চাপা দিয়ে রাখবার অভ্যন্তরীন সাময়িক হিংস্র অভিপ্রায়ে কামিনীকেই মনে মনে খুন করবার অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে চলে গেল। ধরা পড়ে যাবার বা সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবার ভয় থেকেই তৈরি হয়েছে এই ঘোর। অনিশ্চিত জীবনভাবনা বা কঠিন বাস্তবে আছড়ে পড়বার উদ্‌ভ্রান্তি থেকেই তৈরি হয়েছে এই ঘোর— যা সমগ্র উপন্যাসের কাহিনিকে একটি টানটান স্নায়ুউত্তেজনার দিকে সমূলে টেনে নিয়ে গেলে। এবং বলতে দ্বিধা নেই, মধ্যবিত্তের এ-হেন দিকভ্রমী ভুল উত্তেজনাকে কাহিনির সর্বস্তরে আশ্চর্যজনক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া রূপে লেখক মানিক নিপুণ ভাবেই কিন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। একথা আমাদের তো সকলেরই জানা যে দিকভ্রমী উত্তেজনা কখনোই শুব্ধ বিবেকের জাগরণে ঠিক জায়গায় ঠিকঠিক ভাবে আঘাত করতে পারে না। ফলে যে জায়গায় আঘাতটা পড়া উচিত, যে কেন্দ্রে আঘাতটা নামা উচিত— সেখানে সঠিক লক্ষ্যভেদে তা না- পড়ে ভুল জায়গায় গিয়ে অর্থহীন বুদবুদ তোলে মাত্র। মুকুন্দের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। দিকভ্রমী উত্তেজনায় সে কামিনীকে সরাতে চেয়েছে, কামিনীকে মারতে চেয়েছে— বুঝতে চেষ্টা করেনিঃ তার জীবনে নেমে আসা এই সমস্যা বা সংকটের কেন্দ্রীয় উৎপত্তিস্থলে কে বা কারা রয়েছে। কার অদৃশ্য প্ররোচনা তাকে সম্পর্কের হত্যাকারী করে তুলতে চাইছে। ফলে অদৃশ্য শত্রু কে, আর কে-ই বা আসল প্রতিপক্ষ— এসব ভালো করে তলিয়ে বোঝবার আগেই সবচেয়ে আপন স্ত্রী কামিনীর প্রতি অবচেতনে তৈরি হল অক্ষমের অন্ধ আক্রোশ। সুতরাং মনুদের বাড়ি যেতে প্রথমে রাজি হয়েও ট্র্যাংকের গুপ্ত কাহিনিটা ফাঁস হয়ে যাবার প্রাক আশঙ্কায় মুকন্দ যেই অস্বীকার করে বসল যেতে, অনীহা দেখাল যেতে— তৎক্ষণাৎ খেপে গেল কামিনী। ক্ষোভের ছিদ্র বড়ো হয়ে দাম্পত্য কলহের রূপ ধরল। আর এই ঘৃণ্য ও অবুঝ কলহকে স্তব্ধ বা প্রতিহত করবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ঘটে গেল কাহিনি গ্রন্থনার সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটি— মুকুন্দ মেরে বসল (সত্যিই কি মেরেছে?), মুকুন্দ আঘাত করে বসল (সত্যিই কি আঘাত করেছে?), মুকুন্দ প্রবল হিংস্রতায় ঝাঁকাতে শুরু করল (সত্যিই কি ঝাঁকিয়েছে?) কামিনিকে আর একসময় সত্যিসত্যিই চোখের সামনে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেল কামিনী— মৃত্যু হল সম্পর্কের, মৃত্যু হল বন্ধনের, মৃত্যু হল পারস্পরিক গড়ে তোলা আপনতার বোধ-কেন্দ্রের। কিন্তু যেহেতু সবকিছু শেষ হয়ে গেলেও ধৃ-কেন্দ্র আবার নতুন করে উদ্ভূত হয়, সেইহেতু 'খুনী' উপন্যাসের অন্তর্নিহিত জীবনভাষ্যের ধৃ-কেন্দ্রটি এক এবং অব্যাহতই রয়ে গেল আখ্যানের ভেতরে-বাইরে। অন্ধ আক্রোশ এবং তৎপরবতী উদ্ভূত প্রতিবর্তী পরিস্থিতি— এরই মধ্যে মুকুন্দ ঘোরে অর্ধঘোরে ডেকে আনল অভয় ডাক্তারকে। লেখক বর্ণনা দিলেন এর পরঃ

> বিছানার কাছে গিয়ে অভয় মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কামিনীর গলা ও মাথার দৃশ্য থেকে মুকুন্দের

মুখের দৃশ্যান্তরে চোখ সরিয়ে সে বুঝতে পারে মুকুন্দ প্রতীক্ষা করছে কামিনীকে পরীক্ষা করে অথবা না -করে সে কী বলে। অভয় স্টেথোস্কাপ বার করে কানে লাগায়। পরীক্ষা শেষ করে বলেঃ

—মুকুন্দবাবু, উনি তো বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই? ও বেঁচে নেই?

—ফিট হয়েছিল। তারপর হার্টফেল করে মারা গেছেন।

—সত্যি? সত্যি বলছেন অভয় বাবু?

অভয় ডাক্তার (নাম লক্ষণীয়) কামিনীকে পরীক্ষা করবার আগে পর্যন্ত মুকুন্দর চোখমুখ ছিল নিষ্প্রভ ও স্তিমিত, উদ্‌বিগ্ন ও শঙ্কিত। অভয় ডাক্তার তাকে সাময়িকভাবে সেই উদ্‌বেগ বা উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত করলেন বটে— কিন্তু আখ্যানের সর্বত্র, আদি থেকে ক্রমে অন্তহীন অন্তে, মুকুন্দ কিন্তু একটাই অন্তর্গত অবসেসনে সংক্রমিত হয়েছে এবং প্রতিটি মুহূর্তেই আত্মঅভ্যন্তরে দোদুল্যমান থেকেছে। লেখক মানিকও কিন্তু আখ্যানের কোথাও একবারের জন্যও পরিষ্কার করে দেননি যে সত্যি সত্যিই কীভাবে মৃত্যু ঘটেছে কামিনীর। মুকুন্দর উপর্যুপরি চারবার আঘাত? নাকি আকস্মিক হার্টফেল? দেননি মূলত এক স্পষ্ট অভিপ্রায়ে, এক স্পষ্ট চৈতন্যে, আমাদের পৌঁছে দেবেন বলেই। কী সেই অভিপ্রায়? কী সেই চৈতন্য? মুকুন্দর মজ্জাগত হিমশীতল সমাজবিশ্লেষণই কিন্তু সেই চৈতন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক মুকুন্দর অনুভূত ক্রিয়ার সঙ্গে একীভূত হয়ে লিখলেনঃ

> চোখের সম্মুখ হইতে একটা কালো পর্দা যেন সরিয়া যায় মুকুন্দের। চারিদিকে সে দেখিতে পায় এই রকম অজস্র ও বিচিত্র প্রক্রিয়ার হত্যাকাণ্ড। চিকিৎসার অভাবে যারা মরে, রোগ তো তাদের মৃত্যুর কারণ নয়। ডাক্তার থাকিতে, দোকান - ভরা ওষুধ থাকিতে সারিয়া উঠার বদলে যে মরিয়া যায়, হত্যাই তো করা হয় তাকে। পুষ্টির অভাবে যাদের দেহ রোগ ঠেকানোর ক্ষমতা হারায়, আলো বাতাসহীন নোংরা আবর্জনায় রোগের ডিপোতে যাদের রোগের সহবাস করিতে হয়, আত্মরক্ষার সহজ রীতিনীতি যারা জনিবার সুযোগ বা মানিবার মনোভাব পায় না, তাদের অকালমৃত্যু হত্যা ছাড়া আর কী? দেশ জুড়িয়া অনিবার্য গতিতে চলিয়াছে এই মানুষ খুন করার অভিযান, কারও বেলা আকস্মিক, কারও বেলা দ্রুতবেগে, কারও বেলা তিলে তিলে মন্থর গতিতে। মুকুন্দ শিহরিয়া উঠে, তার মাথা ঘুরিয়া যায়। এই প্রকাশ্য ও বিরাট হত্যালীলার মধ্যে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়্যা একটা সে খেয়াল করে নাই, মুখে মুখে অপমৃত্যুর উলঙ্গ ছাপ দেখিয়াও চিনিতে পারে নাই। এ কী অদ্ভুত অন্ধতা তার শুধু কি তার একার? ক-জনের একথা মনে হইয়াছে যে আইনের সংজ্ঞার দু-দশটা খুন ছাড়াও জগতে জগতে অগণ্য খুন চলিতেছে অহরহ। কে দায়ী? কারা দায়ী? মুকুন্দ বসিয়া বসিয়া ভাবে...

মুকুন্দর এই অন্তর্গত ও অন্তর্লগ্ন ভাবটাই সমগ্র আখ্যানে ধৃ-কেন্দ্র ঃ বীজসূত্র। আগে, প্রথম দিকের মুকুন্দ, এভাবে ভাবেনি, এসব কথা ভাবেনি। মধ্যবিত্ত মনের ভেতর, কামিনীর ফাঁকা স্থানে, মগ্ন প্রবাহের মতো এই ভাবনা ক্রমশ তাকে সংক্রমিত করেছে। আচ্ছন্নও হয়েছে সে। এই মগ্ন প্রবাহের মত চৈতন্য ছিল বলেই মুকুন্দর দেশ, কাল, সমাজ ও মানুষ দেখবার চোখ খুলে গেল। তা নয়তো সেও একসময় আত্মমস্থানের জটিল ক্রিয়ায় সুধীন্দ্রনাথের উটপাখি কিংবা জীবনানন্দের সেই অদ্ভুত বোধাক্রান্ত নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মানুষই হয়ে উঠত। মনে রাখা দরকার ঃ লেখক মানিক এই উপন্যাসের বর্ণিত আখ্যানে মুকুন্দকে দিয়ে জোর করে কিছু পালটাতে চাননি, পালটাবার প্রতিরোধে অহেতুক কোনো স্বপ্ন দেখাবারও চেষ্টা করেননি। তিনি শুধু নিঃশব্দে একটা বীজভূমি প্রস্তুত করেছেন। বলা যায় ঃআহাম্মক ও অপদার্থ প্রতিশ্রুতি ছাড়াই এই বীজভূমির কারিগর হয়েছেন তিনি, বীজভূমির নিঃশব্দ প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি। মুকুন্দ সেই বীজভূমির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আপন মগ্নপ্রবাহ নিয়ে, আপন মগ্নচৈতন্য নিয়ে। বিপ্লবী নয় সে; স্বপ্নস্রষ্টা যুগ প্রবর্তকও নয়, সাধারণ, অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত সে। আর একটু বেশি পরিমাণেই অন্তর্বিশ্লেষণে বা আত্মবিশ্লেষণে সক্ষম। আমাদেরই মতো সে ক্ষুধায় কাতর, কামে উৎসুক এবং স্ব-বিরোধিতায় দীর্ণ ও বিব্রত। আমাদেরই মতো সে কখনও মনে করে কামিনীকে সে-ই মেরেছে, আবার কখনো - বা ভেতরে ভেতরে একটা সত্যকেই প্রাণপণে জন্ম বা পুনর্জন্ম দিয়েছে—'না, কামিনীকে সে খুন করে নাই। ওকে খুন করার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। কামিনীর অসুখ ছিল, কামিনী হঠাৎ মরিয়া গিয়াচে।' এভাবেই মুকুন্দর মধ্যে এসেছে আত্মদংশন থেকে আত্মযন্ত্রণা, আত্মদ্বন্দ্ব থেকে আত্মসমীক্ষা। এই আত্মসমীক্ষা এক অর্থে নিজের ভেতর নিজেরও প্রশ্নদীর্ণ পদচারণাও বটে। কিন্তু মুকুন্দ যে তার ভেতর একটু একটু করে ক্রমঅঙ্কুরিত হতে যাচ্ছে— এ ব্যাপারটাও সে আগে থেকে ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি। তাই প্রথম মুকুন্দের কাছে দ্বিতীয় মুকুন্দ যেন অনেকটা নতুন জন্মপ্রাপ্তির বিস্ময় বহন করে আনে। আসলে এই দ্বিতীয় মুকুন্দর জন্মও কিন্তু ধনদাসেরই ধনতন্ত্রের গর্ভে। কামিনী অবলুপ্ত হয়ে যাবার পর প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যহীন মুকুন্দকে আবার রাস্তা থেকে তুলে এনে ধনদাস তাকে যখন নতুন করে প্রেসে চাকরি দিল, অন্য সব রুগ্ন আর্ত ও শীর্ণ মানুষদের সঙ্গে নতুন করে যখন তার সংসর্গ হল — মূলত সেই সংসর্গের মধ্যে দিয়েই মুকুন্দ শত শ্রম, শত শতঝঞ্ঝাটের মধ্যেও কি অনুভব করতে পারল— 'এতদিন সে ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনায় ঠাসা বোমার মতো, চুপসানো বেলুনের মতো নয়।' আসলে ধনদাসের প্রেসে, লোচন - মনা - হরিশ - কুনু - গণেশ প্রমুখ বহুবিধ লাঞ্ছিত মানুষ যেন বা তার চোখ খুলে দিল। মানিক এই সূত্রে লিখেওছেনঃ

বাড়ি ফেরার পথে সে ব্যাকুল আগ্রহে রুগ্ন ও শীর্ণ মানুষের সেই অনায়ত্ত সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে, ছাপাখানার কম্পোজিটাদের ঘরে যে সত্যের ইঙ্গিত সে পাইয়াছিল। এতদিনের আত্মকেন্দ্রিক মনটা তার সংসারের আরও অসংখ্য মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠে । কোনো দার্শনিক তথ্য তার মনে আসে না, তার শুধু মনে হয় আর দশজন অসুস্থ বিষণ্ণ মানুষের মধ্যে তার নিজের সম্বন্ধে এমন একটা জ্ঞান অর্জন করার উপায় আছে, যা তার জানা দরকার, জানা উচিত।

আত্মকেন্দ্রিক আত্মপ্রক্ষেপের সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তা এতদিন শুধু বাইরের মানুষদের সঙ্গে 'কাল্পনিক কুটুম্বিতা'-ই বজায় রেখে মধ্যবিত্ত ক্ষুধা ও কামেই মোহিত হয়ে ছিল। প্রথমে জ্বরে আক্রান্ত লোচন এবং তারপর বিপর্যস্ত কালাচাঁদ পরপর এসে মুকুন্দর এই 'কাল্পনিক কুটুম্বিতা'-র ভ্রান্তি ও অন্তঃসারশূন্যতা ভেঙে একেবারে তছনছ করে দিল। মুকুন্দ দেখল লোচনের জ্বর হয়েছে, তবুও লাল টকটকে চোখ নিয়ে কাজে এসেছে সে। না -এসে উপায় নেই বলে। আবার এইরি পাশাপাশি চল্লিশ বছর বয়সের কালাচাঁদের ছেলেমেয়ে বউয়ের বসন্ত হয়েছে, সেও প্রেসে এসেছে। শুধু তাই নয়, যে দিন বউ ভোরবেলা মারা গেছে, সেদিনও একইভাবে উপস্থির কালাচাঁদ। ছুটি চায় না সে। কারণ? ছুটি নিলে মাইনে পাবে না—এই ভয়, এই আতঙ্ক তাকে বিশ্রীভাবেই ঘিরে ফেলেছে। এরপরই লেখক একটি চমৎকার প্রতীকী দৃশ্যকল্প আমাদের সামনে রেখেছেন —'ব্লটিংয়ে আঁচড় কাটে মুকুন্দ।' মারাত্মক এই প্রতীকী দৃশ্যকল্পের ব্যঞ্জনা। সত্যিই তো। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কত রকম ব্লটিং পেপারেই না রয়ে গেছে ভয়াবহ অলক্ষ্য অন্ধকারে। আমরা জানি ঃ ব্লটিং পেপারের কাজই হল শুষে নেওয়া বা শোষণ করা। লোচন বা কালাচাঁদের জীবনের প্র্যাত্যহিকতায় পুঁজিবাদী ধনতন্ত্র এই ধরনেরই তো ব্লটিং পেপার। শুষে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে। ব্লটিং পেপারের ভূমিকাকে আমরা কিন্তু আবার মুকুন্দর দিক থেকেও বিশ্লেষণ করতে পারি। সেক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে যে প্রথম পর্বের মুকুন্দও ছিল একটা ব্লটিং পেপার, দ্বিতীয় উত্থানের মুকুন্দও যেন বা সেই একই ব্লটিং পেপার—তবে দুই ব্লটিং পেপারের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। প্রথম পর্বের ব্লটিং পেপার রূপে মুকুন্দ শুধু শুষে নিয়েছে যা কিছু নিজের বা নিজের পরিবারকে ভালো রাখবার জন্য লাগে— সেই সব। ব্যক্তিগত ভোগ আর ব্যক্তিগত কাম। মুখ্যত এই ভোগপ্রবণ কাম থেকেই সে কামিনীতে (কাম+ ইন্+ ঈ= স্ত্রী,পত্নী, আকাঙ্ক্ষিত রমণী ইত্যাদি) গেছে। আর দ্বিতীয় পর্বের ব্লটিং রূপে সে দেশের ভেতর থেকে, সমাজের ভেতর থেকে, জীবনের ভেতর থেকে প্রাণপণে টেনে নিতে চেয়েছে শ্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ আধমরা হাড়গিলে মানুষদের মরণাপন্ন ব্যথা বেদনা শীতকে। প্রথমটি ছিল বিষুক্তি। দ্বিতীয়টি অবশ্যই সংযুক্তিত। প্রসঙ্গক্রমে অভিধানগত অর্থক্রম হল ঃ

১। নারায়ণ
২। ফুলের নাম
৩। মোক্ষদাতা

আখ্যানের ভেতর এই নামেরও একটা গভীর তাৎপর্য যেন বা ফুটে উঠেছে। ফুল হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে কোথাও মুকুন্দ কিন্তু ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। মোক্ষদাতা হওয়া সত্ত্বেও সে যেমন নিজের সংসারের মোক্ষদাতা হয়ে উঠতে পারেনি, তেমনই লোচন বা কাঁলাচাঁদের জীবনের ক্ষেত্রেও সে মোক্ষদাতার ভূমিকা নিতে পারেনি। আর নিজেকে নরনারায়ণ (নর+নারায়ণ) রূপে ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা দিতে হলে যা করণীয়, তার কতটুকু করতে পেরেছে মুকুন্দ? সারি বাঁধা 'জীবন্ত ভিখারিগুলি'র মধ্যে সে নরম হতে পারেনি, নারায়ণও হতে পারেনি— শুধু মাকড়শার জালের মধ্যে বসে একান্ত নিরুপায় ভাবে চারদিকে জীবনীশক্তির ক্রমাগত অভাব ও অপচয় দেখে শিউরে উঠেছে। আর একসময় ঘৃণা আর প্রবল বিবেক দংশনে ধনদাসের ধনতন্ত্র ছেড়ে দিয়ে পথে নেমেছে। নামার আগে শুধু শোষিত ও লাঞ্ছিত শিরভাঙা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেছে —'আর আসব না।' এছাড়া আর কীই বা করতে পারে মুকুন্দর মতো মানুষেরা? পুঁজিবাদের পিঞ্জরে বন্দি বহু জীবনের ব্যথিত আহ্বান কানে আর বুকে নিয়ে মুকুন্দ শুধু আমাদেরই মতো ঘৃণা ও বিদ্বেষে আবার জনারণ্যের ভেতরে চলে যায়, জনারণ্যের মধ্যেই মিশে যায়। সেই চলমান অথচ নির্জীব ভিড় থেকে হয়তো একদিন সে সত্যি সত্যিই মোক্ষদাতা বা নররারায়ণ রূপে উঠে আসতে পারে, আবার নাও পারে, কিন্তু আত্মকেন্দ্রের গুটোনো সত্তা ভেঙে মুকুন্দ যে অনেকখানি মুক্ত ও বিস্তৃত হতে পেরেছিল, লেখক মানিক তারও একটি বিশেষ প্রমাণ যেন বা আখ্যানের চকিত উপলব্ধিতে ধারণ করেছেন। মুকুন্দর সেই উপলব্ধি তো আমাদেরও সকলের ভাষা ও ভাষ্য। মুকুন্দের এই ভাষা ও ভাষ্যের দিকে মন ফেরানো দরকারঃ

প্রেসের জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন আধমরা মানুষগুলিকে দেখিতে ধনদাসের প্রতি এক অভূতপূর্ব তীব্র ঘৃণায় তার হৃদয় ভরিয়া যায়। এমন ঘৃণা সে জীবনে কখনও অনুভব করে নাই। ধনদাস যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের খুনেদের প্রতীক আর সে তাকে ঘৃণা করিতেছে তাদের সকলের প্রতিনিধি হিসাবে যারা খুন হইয়াছে ও হইতেছে। সে নিজেও ওদেরই দলে...

এই উপলব্ধি, এই চৈতন্যজাগরণ, এই নিজের ভেতর নিজের মুক্তি— এমন দৃঢ় ও জোরালো অভেদস্থাপনার উপর ঔপনিবেশিক ভাবনা কিন্তু 'খুনী' উপন্যাসের ভিত ও ভিত্তিপ্রস্তর। উপন্যাসের আখ্যানে গিয়ে পারেনি। আসলে স্বপ্ন ও চিন্তা একাকার হয়ে গেলে আদৌ কি তাকে পৃথক করা যায়? যায় না। সমগ্র আখ্যানে মুকুন্দর অবস্থানে স্বপ্ন ও চিন্তার মিশ্রণ অনবরত দ্রুতলয়ে ঘটে যাচ্ছে বলেই মুকুন্দ কিন্তু নিজের বন্ধতার মূলীভূত কারণস্বরূপ কামকে (বা কামিনীকে) অতিক্রম করেই, ভেদপ্রবণ ধনদাসকে (বা ধনতন্ত্রকে) প্রত্যাখ্যান করেই হিমশীতল মজ্জার প্রাথমিক অবরোধ ভাঙতে

পেরেছে। একথা সর্বজনগ্রাহ্য যে মজ্জার হিমশীতলতা এক ধরনের জড়তা। এই জড়তা মানুষের জীবন ও জীবনীশক্তির চরম শত্রু। বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় ঃ জড়তার কাজই হচ্ছে ময়াল সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরা। ভালো মতো গ্রাসে নিতে পারলে মানুষের কার্যকরী ক্ষমতা বলতে আর কিছুই থাকে না। বাস্তবিক জড়তার সংক্রমণ থেকেই সমাজে ও বাস্তবে মানুষ এক সময় নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় পুতুল হয়ে যায়। লেখক মানিক সেই জড়তা - আচ্ছন্ন পুতুল - পরিণতির কথা স্পষ্ট ভাবেই 'খুনী' উপন্যাসের আখ্যানে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের দুই পৃথক অংশে তিনি লিখেছেন ঃ

> ১. চলতে আরম্ভ করে মুকুন্দ সজোরে মাথায় একটা ঝাঁকি দেয়। শোক হোক, কষ্ট হোক। হে ভগবান, সুতীব্র যন্ত্রণা হোক তার, মর্মান্তিক বেদনা জাগুক। আত্মার এই স্তব্ধতা সে সইতে পারে না। মাটির পুতুলের দোকানের দিকে চেয়ে তার মনে হয় জীবন্ত মানুষের এই ভিড়ের মধ্যে, সাইন - বাঁধা ভিখারিগুলির মধ্যে সে যেন জমে গেছে, মাটির মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। পা টেনে টেনে যে চলছে সে অন্য কেউ, সে নয়। পা তার নয়। দেহটাই তার নয়। সে নেই।
>
> ২. তার এতদিনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ব্যর্থতা সার্থকতা ভরা জীবন শুধু জীবনের একটা বিকার মাত্র; নিজের দেহের মধ্যে থাকিয়া এই অজানা অদৃশ্য শত্রু এতকাল তাকে জীবনের রঙ্গমঞ্চে পুতুলের মতো খেলা করাইয়াছে। অ্যালকোহল যেমন মাতালকে মাতাইয়া রাখে, সিফিলিসের বিষ তাকে এতকাল হাসি - কান্নায় মাতাইয়া রাখিয়াছে। ভাবিতে গেলেও মাথা ঝিমঝিম করিয়া আসে মুকুন্দর...

বোঝাই যায়ঃ মুকুন্দর মাধ্যমে মানিক ভাঙতে চেয়েছেন মানুষের পুতুলবৎ আচ্ছন্নতা, নিষ্ক্রিয়তা, প্রাণহীনতা। পুতুল কখনোই অন্যের দুঃখে আর্দ্র হতে পারে না, অন্যের বেদনায় দ্রবীভূত হতে পারে না। অন্যের লাঞ্ছনায় প্রতিবাদী হতে পারে না। সে নির্বিকার, নির্বিকল্প, ভাবলেশহীন। মুকুন্দও এমন পুতুল - সত্তার ভেতর থেকে বার হয়ে আসতে চেয়েছে। অপর বা other -এর সুতীব্র যন্ত্রণায় অবগাহন করে Self -এর আত্মরচিত দুর্গ চূর্ণ করতে চেয়েছে। এইজন্যই 'কাল্পনিক কুটুম্বিতা' নয়— উন্মুক্ত মন চাইল 'বাহিরের জনতা' এবার সানন্দে তার হৃদয়ে প্রবেশ করুক। সে ঠুঁটো পুতুল হয়ে জীবনের রঙ্গমঞ্চে অনুভূতিহীন স্থবিরতার ভূমিকায় আর থাকতে চায় না। এই না - চাওয়াটাই মুকুন্দকে বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার অন্তরালস্থিত খুনীদের চিনিয়ে দিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, যে আঁধারে খুনীরাই শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ ও পরিবেশের সশস্ত্র নিয়ন্তক। এদের অঙ্গুলিহেলনেই সমাজে বাস্তবে পারিপার্শ্বিকতায় মানুষকে কোনো - না কোনো ভাবে নিষ্প্রাণ পুতুলে পরিণত হতে হয়। একদা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিকের পুতুল প্রসঙ্গ গোটা বঙ্গদেশে কম বিতর্কের ঝড় তোলেনি। সে সময় অনেক সমালোচকই অনেক কথা বলে আত্মতৃপ্তির উদ্গার তুলেছিলেন। 'খুনী' উপন্যাসে মানিক আবারও পুতুল - প্রসঙ্গ সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঃ এবার তিনি আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন, অভিজ্ঞ এবং বাস্তবনির্দেশী। এবার আর তিনি তাঁর বক্তব্যের কোথাও অস্পষ্টতা রাখেনি। বরং তিনি ঋজু, তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী। আর তারই প্রতিসরণে মুকুন্দ যখন আত্মস্বীকারোক্তির মন্থনে জানায়— 'আত্মার এই স্তব্ধতা সে সইতে পারে না,' তখন বোঝা যায় ঃ মুকুন্দ অনেকগুলো পুতুল এইবার একসঙ্গে ভাঙতে উন্মুখ ও উদ্গ্রীব। মানুষের নিজস্ব জীবন, সমাজের নিজস্ব স্পন্দন, দেশ ও বিশ্বের অন্তহীন জীবনীশক্তি— এই সবকিছুকে 'পুতুল' হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করে সংরক্ষিত সমাজবাস্তবতার অখণ্ড সাম্যে পোঁছোতে মুকুন্দ কিন্তু 'খুনী' উপন্যাসের আখ্যান থেকেই তার অসমাপ্ত দৌড় শুরু করল। বুঝিয়ে দিল ঃ সে পুতুল নয়, কেননা পুতুল কোনোভাবেই দৌড়োতে পারে না। মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমরা তাই যে মুকুন্দকে দেখতে পাই নতুনরূপে ও নবতর স্বরূপে — সে কিন্তু মধ্যবিত্ত প্রলেতারিয়েতদের মতো হার মানতে মানতেই এক সময় আচমকা আচম্বিতে —'সজোরে মাথায় একটা ঝাঁকি দেয়।' অনুভূতির স্পন্দন আর অন্তর্গত জাগরণী মহাসমন্বয়ের উপলব্ধি না-থাকলে কিন্তু এই 'ঝাঁকি' দেবার তীব্র প্রবণতা তৈরি হয়। বাস্তবের ছায়ারূপ নয়, মুকুন্দ বাংলা কথাসাহিত্যে সত্যিই এক প্রগতি ও পরিবর্তনের সমন্বয়ী বাস্তব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। 'খুনী' তাই মানিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুকৃতি, যেখানে আত্মকেন্দ্রিক ঠোঁট ফাঁক করে শুষ্ক ও ব্যথিত জীবন নতুন মন্থনে কথা বলে উঠেছে।

।। তিন।

সৃজনশীল সাহিত্যজীবনে মানিক বহুবার নানাভাবে নিজীবের, নির্জিতের, নির্জনের, নিঃশব্দের, নিঃসঙ্গের এবং নির্মাণের বহুমুখী ভাষ্য রচনা করেছেন। সেই ভাষ্যের ভেতর দিয়ে মানুষের অন্তর্সংগ্রাম মগ্ন রাজ্যের বহুরকম জটিলতায় ক্রমাগত শোধিত ও পরীক্ষিত হয়ে, ক্রমশ, একটা সময়, বৃহত্তর জীবনের মৌলিক দাবিতে পরিণত হয়ে গেছে। তিনি জানতেন ঃ সময়ের আক্রমণে একদিন মানুষের দেহ ভাঙে, মন ভাঙে, তা সত্ত্বেও ভাঙা হেহের ভাঙা মনের ভেতর কোথাও - না-কোথাও অস্তিত্ববাদী নিষ্ক্রমণের গভীরতর আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। এই নিষ্ক্রমণের পথ সবাই চেনে না, সবাই বোঝে না। যারা চেনে না— তাদের Voice থেকে যায় ভেতরের অন্তর্সংগ্রামে। আর যারা চেনে — তাদের Voice পুঞ্জীভূত অন্ধকারের স্বাদহীন শূন্যতা ও নৈরাজ্য ভেঙে ঘনীভূত সত্যের কৌণিকতায় বার হয়ে আসে রোমান্টিক কুহক আর ইতিবাচক জীবনবোধের দ্বন্দ্ব অন্তর্সংগ্রামের বয়ানে মানিক কিন্তু বারবারই সামনে এনেছেন, সামনে রেখেছেন। মুকুন্দ তারই ক্ষতবিক্ষত প্রতীক ও প্রতিরূপ। সমগ্র আখ্যানে তার নিঃশব্দ রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার পারস্পারিক সম্পর্ক। মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে সুপ্ত বিবেকবোধ একই সঙ্গে আক্রান্ত হয়ে

সিনক্রোনিক ও ডায়াক্রোনিকের যে স্নায়বিক সন্দর্ভ গড়ে তোলে— তারই মধ্যে থাকতে থাকতে মুকুন্দ ক্রমশ অন্বেষণ করেছে নিজেকে, পরিপার্শ্বকে, জীবনের স্বপ্নাচ্ছন্নতাকে। এটাই যেমন ছিল তার অবস্থানগত মেডিটেশন, এটাই তেমনই হয়ে উঠেছে তার ধ্বংসস্তূপের প্রচ্ছন্ন প্রতিন্যাসমূলক প্রতিধ্বনি। অন্তর্বৃত্তের এই নিয়তি, নিয়তির নিঃশব্দ তর্জনী। কিন্তু মানিক নিয়তি মানতেন না, মানতেন অন্তর্সংগ্রাম, মানতেন কিছুটা হলেও হয়তো লিওন ইডেল কথিত 'মেন্টাল প্রাটেল'— মুকুন্দর জন্ম ও উত্থান মুখ্যত সেই দ্বন্দ্ববিক্ষত মুখচ্ছবি নিয়ে রক্তমাংসের নির্জন ছায়াঘন ভেতর থেকে বাইরে আসতে আসতে ক্রমশ তার 'আমি' যেন বা আমরা'-র' অনির্ণেয় বাচন ও বর্ণমালা পেয়ে গেছে। এর জন্য একই সঙ্গে চাই আহরণ এবং অবগাহন। মুকুন্দ তাই করতে করতে তার অস্তিত্বের ভেতর আবার জাগিয়ে তুলেছে চলমান সম্ভাবনা। মনে রাখা দরকার ঃ মানব অস্তিত্বের ভেতর যন্ত্রণাদায়ী শূন্যতাবোধ সবসময় থাকলেও অস্তিত্বের ভেতরকার কথকসত্তার কোনো উপসংহার হয় না। কার অস্তিত্বের মৃত্যু নেই কোনো কালে, বাস্তবতাজারিত চলমান সম্ভাবনাই অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। মূলত এই বিশ্বাস থেকেই মুকুন্দর নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ উপন্যাসের আখ্যানে একইসঙ্গে ঘটেছে। নিজস্ব জটিলতায় তার নির্মাণ আর সচেতন সামাজিক উন্মোচনে তার বহুস্বরিক পুনর্নির্মাণ। একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে আত্মিক সাধনা করা কালে আত্মিক সংকটটাই সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক হয়। মুকুন্দর ক্ষেত্রেও সাধনপথের বিঘ্ন এসেছে প্রথমে কামিনী সংসর্গে এবং পরে যামিনীর সম্ভাব্য সংসর্গে। কামিনী ও যামিনী— এই দুই-ই অন্তর্গত অর্থপ্রক্রিয়ায় বিঘ্নস্বরূপ, বাধাস্বরূপ। মুকুন্দ এই কামিনী ও যামিনীর, অর্থাৎ কাম ও অন্ধকারের বশীকরণ অতিক্রম করেই পৃথিবীর 'প্রকাশ্য ও বিরাট হত্যালীলার' মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরই বুঝতে পেরেছে মানুষের ভেতরের বৃহৎ আয়নাই সমাজ দেখবার এবং জীবন বোঝবার সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন। আর তাই ধনদাসের ধনতন্ত্রে ইস্তফা দিয়ে অনুভবী সম্প্রাসরণের বৃহৎ ব্যাপ্তিতে দাঁড়িয়ে ভেতরে ভেতরে সে পুনর্নির্মিত হয়েছে একটি বিরাট সত্যে পৌঁছে। সে সত্যটি কি? ধনতন্ত্রের দাসত্ব করে, শ্রেণিবিভাজনকে সহযোগিতা করে সে এতদিন ধরে পরোক্ষে নানারকম খুনকেই মদত দিয়ে এসেছে। খুনী না - হয়েও খুনের সহযোগী প্রক্রিয়া সে ছিল। মুকুন্দ এখান থেকে মুক্তি নিয়েই নিজেকে সমপ্রাণের সাম্যে পুনর্নির্মিত করেছে। তাই আখ্যানের একেবারে শেষে কামিনীর মা, মুকুন্দর শাশুড়ি, যিনি মুকুন্দর ঘাড়ে যামিনীকে গছাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন— তার সঙ্গে মুকুন্দর দ্রুতলয়ের সংলাপ বিনিময় অত্যন্ত ইঙ্গিতবাহীঃ

> খবর শুনিয়া কামিনীর মা'র চমক লাগে।
>
> —চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলে বাবা?
>
> —হ্যাঁ। চাকরি বাকরি আর করব না।
>
> যামিনীর মা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলেন, তবে বাবা তুমি যামিনীর জন্য একটি পাত্র খুঁজিয়া দাও।
>
> —দেব, নিশ্চয় দেব।
>
> মুকুন্দ স্নান করিতে যায়।

বঙ্গদেশের মায়েদের কাছে এমন অদ্ভুত নিষ্কর্মা প্রায় বাউণ্ডুলে পাত্রের কোনো মূল্য নেই। তাঁরা তো আত্মিক সংকটের হেতু এবং আত্মিক সাধনার দ্বন্দ্বকে বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছেন না। আর কেনই বা দেখবেন? প্রাত্যহিক জীবন তো স্থূলতর জৈবনিক পটভূমিতেই বর্ধিত হয়। তারা সেই বর্ধিত স্থূল জৈব পটভূমির বাইরেই বা যাবেন কেন? মেয়ের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বলেও তো একটা কথা আছে। সেই নিরাপত্তার তাগিদে মুহূর্তেই খারিজ হয়ে যায় মুকুন্দর মতো চাকরিহীন মানুষেরা। আখ্যানের শেষ তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—'মুকুন্দ স্নান করিতে যায়' মানুষ স্নান করে কেন? পরিষ্কার হবার জন্য। মুকুন্দও পরিষ্কার হতে স্নানে প্রবেশ করল। খুনী নিয়ন্ত্রিত সমাজে ও বাস্তবে বহুরকম খুনে পরোক্ষ সহযোগিতা করতে করতে অনেক রকম ময়লাই তো জমে উঠেছে মুকুন্দর ভিতরে - বাহিরে। নৈতিক সেই সব স্খলন, পতন, ক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণুতা ধুয়ে মুছে একটি পরিষ্কার সাফসুতরো মানুষ হয়ে ওঠবার জন্য এই 'স্নান' অত্যন্ত জরুরি, এই স্নান অনিবার্য। কামিনীর পর যামিনীকে সহজ নিরাসক্তিতে প্রত্যাখ্যান করবার মধ্যে দিয়েই এই স্নান শুরু হয়েছে। কবে শেষ হবে? কখন শেষ হবে এই স্নান? মুকুন্দ জানে না, আমরাও জানি না। অসমাপ্ত স্বাধীনতার পরেও আমাদের চৈতন্যের অপেক্ষা ও পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। ক্রমমুক্ত হবার এবং ক্রমমুক্তি পাবার কাজটা তো সহজ কর্ম নয়। সে অনেক শতাব্দীরই মনীষা ও মনীষীর কাজ। 'খুনী' উপন্যাসে সেই কাজটাই শুরু করে গেছেন আমাদের প্রিয় ও মহৎ লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।